সমস্পর্শ

নভেম্বর ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

শিশু শিক্ষায় গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশের গুরুত্ব

তপন কুমার দাস

শিশু পূর্ণবয়স্ক মানবে পরিণত হয় শিক্ষা গ্রহণ করে। এই শিক্ষা পায় প্রথমে পরিবারের কাছে, অর্থাৎ বলা যায় মাতা-পিতার কাছ থেকে। শিক্ষা কিন্তু একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিছু না কিছু শেখে। শিশুর জন্মের পর শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল তার মায়ের কোল। যখন সন্তান আধো আধো কথা বলা শুরু করে, মা তখন পরম যত্নে শিশুকে তার চারপাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

জন্মের পর শিশুর শিক্ষা পরিবারের আওতাভুক্ত থাকে। পরিবার ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল হলে শিশুর শিক্ষাও সঠিক ও সুন্দর হয়। এখানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকাই প্রধান। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আগে গৃহের পরিবেশই হল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন, যেখানে থেকে শিশুর শিক্ষার ভিত তৈরি হয়। শিশুকে সমাজের কাছে পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা বিরাট। শিশুর আচরণের ওপর পরিবারের সাংস্কৃতিক ধারণার প্রভাব সুস্পষ্ট। পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থান, পারিবারিক কাঠামো প্রভৃতি শিশুর আচরণ অনুধ্যানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক লেখক, গবেষকরা স্বীকার করেছেন পরিবারের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া শিশুর বিকাশে সুষ্ঠু ধারা ও সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। পারিবারিক নিয়ম, শৃঙ্খলা, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমেই একজন শিশু সমাজে প্রত্যাশিত আচরণ করতে শেখে। পরিবারই শিশুকে সমাজের কাছে পরিচিতি প্রদান করে। গবেষণায় জানা গেছে, শুধুমাত্র সাধারণ ও পারিবারিক সমস্যা নয়, শিক্ষার্থীর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনও তার শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করতে পারে। তাকে অমনোযোগী হতে, স্কুল পালাতে উদ্বুদ্ধ করে।

মায়ের সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। গবেষকেরা বলেছেন, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা তথা মায়ের কাছ থেকে জীবনের সূচনায় অর্জিত শিক্ষা আবশ্যকীয়ভাবে ভবিষ্যৎ জীবন পথনির্দেশ করে। মায়ের কোল বালক-বালিকাদের পাঠশালা স্বরূপ। সেখানেই মানুষের উত্তম ও অনুত্তম গুণাবলির সব কিছু শিক্ষা অর্জিত হয়। একজন সন্তানকে সৎ চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে তার সূচনা করতে হবে মাতৃকোল থেকেই।

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, ‘আমাকে একটি ভাল মা দাও, আমি তোমাকে একটি ভাল জাতি উপহার দেব।’ অর্থাৎ, নেপোলিয়নের দর্শন হল মানুষের নৈতিক গুণাবলি অর্জিত হয় শৈশবকাল থেকে আর শৈশবের শিক্ষা অর্জিত হয় মায়ের কোলেই। তাই শিশুর চিরন্তন স্বভাব গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। মায়ের কাছে শিশু শেখে উদারতা, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সত্য কথা বলা। একজন মা-ই তার শিশুকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পারেন। শিশুর আত্মবিশ্বাস অর্জিত হয় মায়ের কাছ থেকেই।

একজন প্রকৃত মা-ই শিশুকে বড় বড় মনীষীদের গল্প শুনিয়ে তাদের মনে বড় হওয়ার স্বপ্ন জাগাতে পারেন। প্রত্যেক শিশু প্রথম শিক্ষা পায় মায়ের কাছে। আর প্রথম শিক্ষা শিশু বিনা বিচারে গ্রহণ করে। তাদের তখন যা শেখানো হয় তা-ই তারা সত্য বলে গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ীই তাদের মন ও মানসিকতা তৈরি হয়। প্রত্যেক মায়ের তাই ভেবে দেখা উচিত তাদের মোকলমতি সন্তানদের হৃদয় উদ্যানের উর্বরভূমিতে কেমন গুণাবলির চারা রোপণ করতে হবে।

জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল শৈশবকাল। শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য এ সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় পারিবারিক পরিবেশ যেন নিরাপদ ও শিশুবান্ধব হয় তার প্রতি যেমন অভিভাবকদের যত্নশীল থাকা প্রয়োজন তেমনি বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুবান্ধব রাখার প্রতি শিক্ষকদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সকল গুণাবলি, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিবারে ও বিদ্যালয়ে সুনিশ্চিত থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে গৃহ পরিবেশে পিতামাতা, পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিবিড় ভালবাসা যেমন দরকার তেমনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের দায়িত্ব-কর্তব্য থাকা দরকার। শিশুবান্ধব পরিবেশ বলতে শিশুর চলাফেরা ও কাজকর্মের প্রতিটি স্থানকে শিশুদের উপযোগী হওয়া বোঝায়।

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিশুর সামাজিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। বিদ্যালয়ের কেন্দ্রবিন্দু হল শিক্ষার্থী। পরিবার থেকে শিশু বাইরের পৃথিবীতে পদার্পণ করে মূলত বিদ্যালয়ে আগমনের মাধ্যমে। যদিও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় তাদের আগেই ঘটে থাকে। কিন্তু অজানা জগৎকে জানতে বুঝতে বিদ্যালয়ে আগমন হল পরিবারের বাইরে শিশুর প্রথম পদক্ষেপ। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলেও তাদের গড়তে শিক্ষকদের ভূমিকাই আসল। পরিবারের সদস্যদের বাইরে শিশুর প্রধান ভরসাস্থল হল শিক্ষক। শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যালয়ে আগমনের পরে শিশু আদর্শ বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি ঐক্য, দলীয় মনোভাব, মিলেমিশে কাজ করার প্রবণতা ও শরীরচর্চার শিক্ষা পায়।

বিদ্যালয়ে শিশু বিচরণের অধিকাংশ সময় কাটে শ্রেণিকক্ষে, কাজেই শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। পঠনপাঠনে আগ্রহী করে তুলতে ছড়া, গান, গল্প, কবিতা, ছবি, নাটক ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়ে রাখতে হবে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময়

শেষাংশ ২ পাতায় ....

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

শিশু দিবসের সার্থকতা

শিশু দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ নিয়ম করে পালন করা হয় প্রতিবছর। একদিনের জন্য অনেক বঞ্চিত শিশুর মধ্যে কিছু শিশুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। শিশুদের অধিকার দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নানা আলোচনা করেন। আমরা জানতে পারি। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশু সুরক্ষার স্বার্থে কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। এই সংগঠনগুলির কাজের নানা সাফল্যের কথাও শোনা যায়। শিশু সুরক্ষায় আছে নানা আইন ও সরকারি প্রকল্প। বিভিন্ন সময়ে শিশুর অধিকার নিয়ে নানা সভা আয়োজন করা হয়। কিন্তু জনমানসে শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা নেই বললেই চলে। তাই নিয়মিত হয়ে চলা শিশুর নির্যাতনের ঘটনায় সমাজে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কোনও কোনও ঘটনায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও সামগ্রিকতার বিচারে তা খুব একটা দাগ কাটতে পারে না। তাই বাল্যবিবাহ, ১৮ বছরের আগেই মা হওয়া, শিশুশ্রম, শিশু পাচার, শিশু নির্যাতন কোনও কিছুই বন্ধ হয় না। বছর বছর সরকারি ও বেসরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। সেই পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্ক, লেখালেখি, আলোচনা চলে, কিছুদিনের মধ্যেই আবার সব স্বাভাবিক। আবার নতুন তথ্য, নতুন আলোচনা...।

একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশু। সকলেই জানে এই শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। শিশুদের ভোটাধিকার নেই, তাই জনপ্রতিনিধিদের ভোট চাইতে শিশুদের কাছে যেতে হয়না। বাজেট পরিকল্পনার সময় শিশুদের জন্য বরাদ্দ তাই কমিয়ে দেওয়া যায়। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেই বাজেট পর্যালোচনা করে, সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সামাজিক কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। শিশুদের জন্য বরাদ্দ বাড়ে না। শিশুর অধিকার রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে ওঠে না। কারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তা প্রয়োজন হয়না। তার জন্য আছে নানা কৌশল। সেসব রাজনৈতিক নেতাদের ভালই জানা আছে। তাই খুব হইচই না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের সমস্যা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই।

অভিভাবক তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শিশু অধিকার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন এবং সক্রিয় হলে জন প্রতিনিধিদের বাধ্য করতে পারেন শিশুদের নিয়ে ভাবতে। আমাদের মতো সামাজিক সংগঠনের দায় সচেতনতা প্রসারের এবং শিশুর অধিকারের বিষয়গুলি রাজনৈতিক ইস্যু করে তোলা।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকারগুলি যেদিন প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছাবে, সেদিনই শিশু অধিকার দিবস পালন করা সার্থক হবে।

পুস্তক পরিচিতি

নিপীড়িতের শিক্ষাবিজ্ঞান

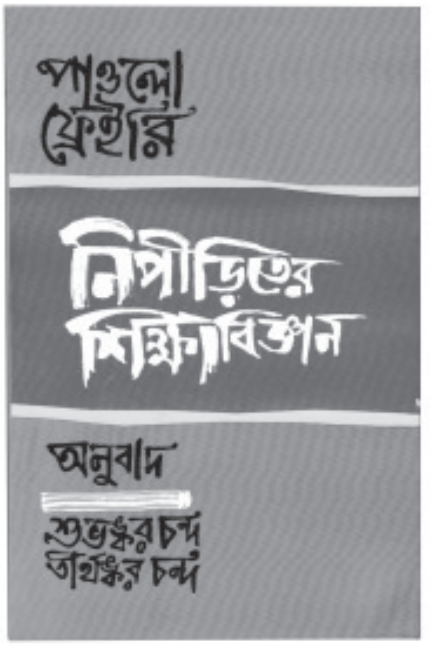

শিক্ষা বিষয়ে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত পাওলো ফ্রেইরি-র বিখ্যাত বই, 'পেডাগজি অব দ্য অপ্রেসড' দীর্ঘদিন ধরেই বহু আলোচিত। এই বইতে পাওলো ফ্রেইরি তাঁর শিক্ষা-চিন্তার সামগ্রিক দার্শনিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। আমাদের এই রাজ্যে বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ একসময় চেষ্টা করেছিলেন পাওলো ফ্রেইরি-র পদ্ধতি প্রয়োগ করার। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছু ফলাফলও পেয়েছিলেন। নানা কারণে সেই প্রয়াস ব্যাহত হয়েছিল।

সেই বহু আলোচিত বইটি বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করেছেন শুভঙ্কর চন্দ এবং তীর্থঙ্কর চন্দ। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করেন তাঁদের কাছে এই অনুবাদকদ্বয় ধন্যবাদার্হ হবেন। এই অনুবাদ গ্রন্থটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখেছেন সলিল বিশ্বাস। এই ভূমিকায় পাওলো ফ্রেইরি-র শিক্ষা-চিন্তার দর্শন এবং পদ্ধতি সংক্ষেপে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, ''পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষাচিন্তার মূল কথা হলঃ প্রতিটি মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা যিনি পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারেন এবং নতুন করে গড়তে পারেন। মানুষের চেতনা রূপ পায় আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর তার নিজস্ব পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে। বিশ্লেষণী চেতনা মানুষকে ভাবনা থেকে কাজে অগ্রসর হতে শেখায়। শোষকের আরোপিত নৈঃশব্দের সংস্কৃতি নিপীড়ন জারি রাখতে সাহায্য করে এবং মিথ্যা কিছু ভাবনার মধ্যে আটকে রাখে। সেই নৈঃশব্দ ভাঙতে পারে একমাত্র শিক্ষা। সেই দিক থেকে শিক্ষাদান একটি নাশকতামূলক কাজ। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যই হল চেতনায়নের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে মুক্তি অর্জনের পথ করে নেওয়া।'' এই অনুবাদ গ্রন্থটির বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

নিপীড়িতের শিক্ষাবিজ্ঞান, পাওলো ফ্রেইরি, অনুবাদ - শুভঙ্কর চন্দ এবং তীর্থঙ্কর চন্দ। প্রকাশক - তথ্য তক্কো অণু গ্রন্থমালা। বিনিময় - ২২৫ টাকা।

---

১ পাতার শেষাংশ....

যথাসম্ভব বাস্তব উদাহরণ, পাঠে সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে পাঠদান সহজ ও আকর্ষণীয় হয়। শেখানোর কার্যাবলির প্রতিটি ধাপে শিশুদের প্রতি আন্তরিক মনোভাব ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য পরিবেশ শিশুবান্ধব করার জন্য নিয়মিত বাগান পরিচর্যা, শ্রেণিকক্ষে ছবি আঁকা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়গুলি রাখতে হবে, যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা, শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা।

দেখা গেছে, শিক্ষকরা সবসময় শিশুর মুদ্ধিমত্তা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেন, কিন্তু কখনই তাদের আবেগ ও অনুভূতির ওপর জোর দেন না। ফলে বহির্মুখী শিশু ও অন্তর্মুখী শিশু এই দু'ধরনের শিশুর কাছ থেকে একই ফল প্রত্যাশা করা যায় না। তাই শিক্ষকদের উচিত হবে একজন অন্তর্মুখী শিশুর কাছ থেকেও একই ফল প্রত্যাশা করতে হলে অন্তর্মুখী শিশুকেও আলাদাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। এখানেই শিক্ষকের পারদর্শিতা।

সবশেষে বলি, শিক্ষা ছাড়া আলোকিত মানুষ সৃষ্টি কোনওভাবেই সম্ভব নয়। একজন শিক্ষকের কিছু কাজ ও দায়বদ্ধতা আছে। আর সেই কাজ ও দায়বদ্ধতা সমাজের কাছে, দেশ ও জাতির কাছে, আগামী প্রজন্মের কাছে। একজন সফল মানুষের পেছনে পরিবার ও শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী...

সৌম্যজিত রক্ষিত, ষষ্ঠ শ্রেণি

প্রাচীনকালে ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে প্রকৃতি মায়ের আলিঙ্গনে শিক্ষালাভ করত। ক্রমে ক্রমে কালের নিয়মে চারিপাশের নির্মল সবুজায়ন কাটা পড়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর তার জায়গা নিয়েছে ইট, কাঠ, পাথরের আকাশচুম্বি ফ্ল্যাট, বাড়ি, কলকারখানা। পাশাপাশি তৈরি হয়েছে শিক্ষাকেন্দ্র এবং স্কুল-কলেজ। অবশ্য বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনে এখনও প্রকৃতির মাঝে, ছাতিমতলায় বসে ছাত্ররা শিক্ষাগ্রহণ করে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের মধ্যে জানার আগ্রহ, উন্নতির চরম শিখরে ওঠার ইচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই, ছাত্রজীবনে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় তারা জয়ী হতে চায়। স্কুলে বিরাট সিলেবাস ও ছোটোবড়ো, মোটা মোটা সব বই, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, প্র্যাক্টিকাল, হাতে লেখা, না জানি আরও কতপ্রকার খাতার বোঝা থাকে এই ব্যাগে। খাতা জমা থাকলে, ব্যাগের বোঝাটা একটু হালকা হলেও খাতাগুলি যখন ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন আবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে মুষড়ে পড়তে হয়। ছাত্রজীবনে পিঠের এই প্রচণ্ড ভারী ব্যাগের বোঝা বইতে ছাত্ররা অপারগ। তবুও বাধ্য হয়ে যখন সেই বোঝা বইতে হয়, তখন ছাত্রদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বিরাট সিলেবাস, মোটা মোটা খাতাবই বোঝাই এই স্কুলব্যাগ নিয়ে ছাত্ররা স্কুলে, প্রাইভেট টিউটরদের কাছে রাতদিন যাতায়াত করে, আবার এতে শারীরিক ক্ষতি হয়। ভারী ব্যাগের কারণে শিশুরা মেরুদণ্ডের ব্যথা ও নানা জটিলতায় ভুগছে। পিঠের এই দীর্ঘদিনের বোঝার জন্য তাদের মেরুদণ্ড বেঁকে যায়, ক্রমশ তারা ঝুঁকে পড়ে এবং অস্থিসন্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শৈশব থেকে এই ভার বহন করলে, ভবিষ্যতে অনেক ঝুঁকি থেকে যাবে। সেইজন্য পড়ার সিলেবাস, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ির কাজ এবং ব্যাগের খাতা-বই এর পরিমাণ কম করাই শ্রেয়। আমি, আমার থেকেও ছোটো ভাইবোনদের ভারী ব্যাগ বহন করতে দেখি, তাদের এই দূর্দশা আমাকে ব্যথিত করে, পীড়া দেয়, আমি যদি এই ভার লাঘব করতে পারতাম, তবে খুশি হতাম।

শিশুরাই আগামী প্রজন্ম, দেশের ভবিষ্যত জাতির ভবিষ্যত, এক অঙ্কুরিত প্রাণ। অঙ্কুরেই যদি ভঙ্গুর হয়, তবে সে ভাবী বনস্পতি হবে কি করে? আগামী-র চালক এই শিশুরা দেশ ও দশের উন্নয়নের পথে যেন অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে জানাই, কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে, পাঠকের কলামে - এক পিতা তাঁর সন্তানের স্কুলের সিলেবাস এবং ভারী ব্যাগের নিদারুণ কাহিনী লিখেছিলেন। সেটা পড়ে আমার মনটা নড়ে উঠেছিল। সমাজ সচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যারা আছেন, তাঁরা এই বিষয়ে আন্দোলন করেন। জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্রে পড়েছি, দিল্লি হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, প্রাক স্কুল পর্যায়ে শিশুদের ব্যাগের ওজন, শিশুদের ওজনের দশ শতাংশ কম করা উচিত। আদালতের রায়ের কারণে যদি, পিঠের বোঝার ওজন একটু কমে, আমি তাই আশাবাদী হয়ে আছি।

কানের কাছে গুনগুনিয়ে ওঠে শিল্পীর সেই গান -
‘স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী, আমরা কি আর বইতে পারি
এও কি একটা শাস্তি নয়, কষ্ট হয়, কষ্ট হয়।
আমার কষ্ট বুঝতে চাও, দোহাই পড়ার চাপ কমাও
কষ্ট হয়, কষ্ট হয়।

সৌজন্যে ঃ চিত্রকর, একত্রিশ বর্ষ ২০১৮

স্কুলব্যাগের ওজন কমাতে কেন্দ্রীয় নির্দেশ

মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ পাঠিয়েছে স্কুল ব্যাগের ওজন হাল্কা করার জন্য। স্কুল ব্যাগের ওজন ও পড়ার চাপ কমাতে এই নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কোনও ‘হোমওয়ার্ক’ নয়। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোন শ্রেণির পড়ুয়ার স্কুল ব্যাগের ওজন কত হবে, তা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন সর্বাধিক দেড় কিলোগ্রাম। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত দুই থেকে তিন কিলোগ্রাম। ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত চার কিলোগ্রাম। অষ্টম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোগ্রাম এবং দশম শ্রেণির জন্য পাঁচ কিলোগ্রাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০০৬ সালের কেন্দ্রীয় আইনে বলা হয়েছিল, পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি করা যাবে না।

সংগঠন সংবাদ

বাজেট বিশ্লেষণ ও শিশুদের জন্য বরাদ্দ

সেভ দ্য চিলড্রেন - এর উদ্যোগে গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ কলকাতার হোটেল হিন্দুস্তান ইন্ট্রারন্যাশনাল-এ শিশুর জন্য বাজেট বিষয়ক এক বিশ্লেষণমূলক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভার শুরুতে চিত্তপ্রিয় সাধু সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং এই আলোচনাসভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। অলকা সিং বলেন, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রস্তাবের ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বরাদ্দ রাজ্যের জন্য ৩২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২ শতাংশ হয়েছে, ফলে রাজ্যের দায়িত্ব বেড়েছে। ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অমর নাথ হাব্বার কাল্লে বলেন, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রস্তাবের ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব থেকে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও কার্যত রাজ্যের আয় কমেছে নানাভাবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ কমেছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে পূর্বের তুলনায় কেন্দ্রের অনুদানের হার কমেছে এবং রাজ্যের অনুদানের হার বেড়েছে। ঠিক সময়ে টানা না পাওয়া, বরাদ্দ অর্থের সবটা না পাওয়া, বাজেটে বরাদ্দ অর্থের তুলনায় বাস্তবে কম খরচ হওয়া, এইরকম নানা সমস্যার কথা তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

বাজেট বিশ্লেষণের পর শিশুদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে সরকারের সাথে ওকালতির কাজ কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এই পর্বের আলোচনা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রবীর বসু। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা আলোচনার অংশগ্রহণ করে তাঁদের মতামত দেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং মতামত দেন।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে গত ২০ নভেম্বর, ২০১৮ কলকাতায় সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সুকন্যা হোমের শিশুরা নৃত্য পরিবেশন করে। স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। উদ্বোধনী ভাষণ দেন নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ। প্রাক্তন বিচারপতি অসীম কুমার রায় আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবসের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। যে সকল শিশুরা শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাঁদের বীরাঙ্গনা ও বীরপুরুষ পুরস্কার দেওয়া হয়। মোট ২০ জন শিশুকে বীরাঙ্গনা এবং ৬ জন শিশুকে বীরপুরুষ পুরস্কার দেওয়া হয়। বীরাঙ্গনা পুরস্কার পায় সঙ্গীতা সরকার, রূপা বৈদ্য, রুনিয়া তরফদার, পমি মাহাতো, টুকটুকি মালী, তুহিনা হালদার, রেনুজা খাতুন, মহিমা হালদার, সুমি খাতুন, কদম বাউড়ি, প্রিয়াঙ্কা সিংহ রায়, শ্রাবণী মণ্ডল, সায়নী হালদার, অয়ন্তিকা প্রামাণিক, ইন্দ্রানী দাস, তনুশ্রী প্রসাদ, পৌলমী সিংহ, সীমা শাহ, রুম্পা প্রামাণিক, দিপিতা দাস মুখার্জী। বীরপুরুষ পুরস্কার পায় আকাশ প্রামাণিক, অতনু নস্কর, সুতীর্থ মহাপাত্র, মিহির মণ্ডল, শুভ মণ্ডল, অনিল সিং। এছাড়াও যে সকল পুলিশ শিশুদের সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদেরকেও পুরস্কার দেওয়া হয়। যে সকল সাংবাদিক শিশুদের বিষয়ে লিখেছেন এবং প্রতিবেদনে শিশুদের বিষয় তুলে ধরেছেন তাঁদেরকেও শিশুশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে শিশুদের নিরাপত্তা বিষয়ে শিশুদের মতামত শুনতে একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনাটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য সুদেষ্ণা রায়। বিভিন্ন হোম ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। যাদুকর অরিন্দম মজার মজার খেলা দেখিয়ে উপস্থিত শিশুদের আনন্দ দেয়। পাঁচ শতাধিক শিশু এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

রাজ্য কার্যকরী কমিটির সভা

গত ২৩ নভেম্বর, ২০১৮ রাজ্য কার্যালয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য কার্যকরী কমিটির সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি, বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু এবং বিদ্যালয়ের নিরাপদ পানীয় জল ও শৌচালয় বিষয়ে সমীক্ষাপত্র চূড়ান্ত করা এবং সমীক্ষার সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি প্রয়োগের দাবিতে ২টি পোস্টার ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে শিশুদের জন্য ইস্তাহার তৈরি, প্রচার ও ওকালতির কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলাস্তরে সদস্য ও শিশুদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের জন্য দাবিপত্র তৈরি করা হবে, শিশুদের জন্য ইস্তাহার তৈরি করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সেভ স্কুল পলিসি' বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্যকে জানানো হয়। বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি কার্যকর করার দাবিতে ছাত্রদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সাংগঠনিক বিষয় আলোচিত হয়। সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কল্যাণী পালুই।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কর্মশালা

গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি এবং সমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক। গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ কাঁথি শহরে আয়োজিত এই কর্মশালায় সংগঠনের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করেন। গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সমীক্ষা পদ্ধতি এবং তিনটি সমীক্ষাপত্র এবং সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সমগ্র কর্মশালাটি পরিচালনা করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা আহ্বায়ক এবং রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য সমর বরণ মান্না। মোট ২০ জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর দিনাজপুর জেলা

উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি, সমীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রায়গঞ্জ শহরে জেলা নেটওয়ার্কের অন্যতম সদস্য ভারতী সরকারের বাড়িতে আয়োজিত এই কর্মশালায় মোট ১০ জন সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন। গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি এবং সমীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সুরজিৎ দাস এবং সোমা দাস। সমগ্র কর্মশালাটি পরিচালনা করেন জেলা আহ্বায়ক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কবিতা দাস।

পূর্ব বর্ধমান জেলা

পূর্ব বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ২ ডিসেম্বর, ২০১৮ জেলার পূর্বস্থলী - ২ নং ব্লকের অন্তর্ভত পারুলিয়ার শিবতলায় জেলা কমিটির সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি, বিদ্যালয় ছুট শিশু এবং বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও শৌচালয়ের অবস্থা বিষয়ে সমীক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকে প্রসেনজিত সরকার, পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকে কার্তিক চন্দ্র দাস ও প্রদীপ মুখার্জী ও মন্তেশ্বর ব্লকে সুদীপ্ত মণ্ডল সমীক্ষাগুলি করবেন। গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ রাজ্যস্তরের কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী VLCPC বিষয়ে ১০টি সংসদে, বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু বিষয়ে ৫টি গ্রামে ও পানীয় জল ও শৌচাগার বিষয়ে ১৫টি বিদ্যালয়ে সমীক্ষা করা হবে। আগামী ১৪.১২.২০১৮ তারিখে প্রতিটি ব্লক থেকে জেলা আহ্বায়ক সমীক্ষাপত্রগুলি জমা নেবেন। সমস্ত সমীক্ষাপত্রগুলি দেখে ১৫.১২.২০১৮ তারিখে রাজ্য অফিসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি এবং সমীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এই কর্মশালাটি পরিচালনা করেন জেলা আহ্বায়ক এবং রাজ্য কমিটির সদস্য দিলীপ পাল। বিথারী দিশা সংগঠনের কার্যালয়ে আয়োজিত এই কর্মশালায় মোট ১২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ জেলা কার্যকরী কমিটির সভায় সব সমীক্ষাপত্র জমা নেওয়া হবে এবং তা রাজ্য কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

শিক্ষা নিয়ে যুব সম্মেলন

ইন্ডিয়ান ইউথ ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং স্প্যান এর সহায়তায় ৬ এবং ৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ মৌলালি যুব কেন্দ্রে আয়োজিত হয়েছিল জাতীয় যুব সম্মেলন। সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে সোমেলি চক্রবর্তীর গান দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী বিদ্যালয়

সংগঠন সংবাদ

সুরক্ষা নীতি, পকসো আইন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। রাইট টু এডুকেশন ফোরামের জাতীয় আহ্বায়ক অম্বরীশ রাই শিক্ষা অধিকার আইন সুনিশ্চিত করতে আইনটির পরিধি বিস্তৃত করার কথা বলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড় রাইট টু এডুকেশন ফোরামের প্রতিনিধি গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউনিসিফের পক্ষে অমৃতা সেনগুপ্ত সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সম্প্রীতি মুখোপাধ্যায় যুবকদের সার্বিকভাবে ভাবনার কথা বলেন। তিনি বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করেন এবং সাম্প্রতিক কালের শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সম্মেলনে মোট ৭টি রাজ্যের যুব প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ইন্ডিয়ান ইউথ ফেডারেশনের উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক এবং যুবক ও ছাত্র ইউনিয়নের মতামত সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদের সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকোন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক ও মোহাটি বিবেকানন্দ যুব সংঘের যৌথ উদ্যোগে গত ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯ খেজুরি- ১ নং ব্লকের অন্তর্গত মোহাটি গ্রামে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে এক আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক এবং ওয়েবেনের রাজ্য কমিটির সদস্য সমর বরণ মান্না। তিনি এই প্রসঙ্গে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কাজ ও কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন।

এগরা মেলায় ওয়েবেন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমা মেলায় গত ৪ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি, ২০১৯ ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের এগরা পৌরসভা কমিটির পক্ষ থেকে একটি স্টল দেওয়া হয়। স্টলে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা এবং শিক্ষা অধিকার বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শন করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের কর্মসূচি নিয়ে মেলায় উপস্থিত বহু মানুষের সাথে মত বিনিময় হয়। মেলায় ৬ জানুয়ারি, ২০১৯ শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা এবং শিক্ষা অধিকার নিয়ে ওয়েবেনের উদ্যোগে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। মাধব চন্দ্র পয়ড্যা, সুকুমার পানিগ্রাহী এই আলোচনায় বক্তব্য রাখেন।

পরিযায়ী শিশুদের শিক্ষার অধিকার - আন্তঃরাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-এর যৌথ উদ্যোগে পরিযায়ী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে সম্প্রতি এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। গত ৩০ জানুয়ারী ২০১৮ পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সভার শুরুতে আয়োগের সচিব সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় পরিযানের ফলে শিশুদের ওপর কী প্রভাব পড়ে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানান এবং এই আলোচনাসভার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচন করেন। তিনি বলেন, একবছর আগে এই বিষয়ে বেশ কিছু কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তগুলি কতদূর এগিয়েছে এবং আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা আলোচনার প্রয়োজন। সেভ দ্য চিলড্রেন - এর পক্ষে চিত্তপ্রিয় সাধু বলেন, ১০ বছর আগে পরিযায়ী শিশুদের শিক্ষা বিশেষ করে ইট ভাটায় কর্মরত অভিভাবকদের সাথে যে সকল শিশুরা আসে তাঁদের শিক্ষার অধিকার কার্যকর করার বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছিল রাজ্যে রাজ্যে সমন্বয় এবং একসাথে কাজ করা প্রয়োজন। আই ডি এস কে-র ডিরেক্টর অচিন চক্রবর্তী ইউনেসকো প্রকাশিত গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষা অধিকার আইনে ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা দরকার। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা কমল গৌড় ইউডাইস-এর সাথে ওকালতি, বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু করে তোলা এবং কাজের জন্য পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেন। পশ্চিমবঙ্গ সর্ব শিক্ষা মিশনের স্টেট কো-অর্ডিনেটর চাইল্ড রেজিষ্টারের ওপর ভিত্তি করে পরিযায়ী শিশু এবং বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন। হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিমল মণ্ডল জানান, সকলের সহযোগিতা পেলে তিনি তাঁর ব্লককে মডেল ব্লক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। ঝাড়খণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর বিনোদ কুমার এবং বিহারের পক্ষে ধর্মেন্দ্র কুমার গুপ্তা তাঁদের রাজ্যে কীভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন তার বর্ণনা দেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের যুগ্ম

পরিযায়ী শিশুদের শিক্ষার অধিকার বিষয়ে আলোচনা সভা

আহ্বায়ক প্রবীর বসু অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন। সরকারি আধিকারিক ছাড়াও এদিন ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক, বিক্রমশীলা, সার্ভিস সেন্টার সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন।

বইমেলায় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ

৪৩তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইবেলায় পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ শিশুদের আনন্দ দিতে এবং শিশু অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি স্টল দেয়। গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মেলাতে নারী ও শিশু এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা এই স্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চ্যাটার্জী চক্রবর্তী, আয়োগে অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং আয়োগের সচিব সুদীপ্তা চ্যাটার্জী। শিশুদের আনন্দ দিতে উপস্থিত ছিলেন দুই জনপ্রিয় শিল্পী মানালী এবং শেখর। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং শিশুরা স্টলে উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন। শিশু সুরক্ষা আয়োগের স্টলে প্রতিদিন শিশুদের ছবি আঁকা, নাটক শেখানো ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বইমেলায় ড. শশী পাঁজা শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের স্টল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা

পাঠক্রমের সংরক্ষণ ভাঙতে হবে

দেবব্রত মজুমদার*

একটা সাম্প্রতিক সমীক্ষায়[১] প্রকাশ ওড়িশার একটা অঞ্চলের আদিবাসীদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে তারা জীবনশৈলীর স্বাভাবিক শিক্ষা হারাচ্ছে। স্কুলে কলেজে তারা যেসব বিষয় পড়ছে, তার সঙ্গে তাদের জীবনশৈলীর কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক দূরে ছোটাছুটি করে স্কুল কলেজে গিয়ে আর সেখানকার পাঠ্য মুখস্থ করে পরীক্ষায় লিখে অনেকেই পাশ করছে। কিন্তু গ্রাজুয়েট হওয়ার পর স্থিতু হয়ে তারা দেখছে, নিজেরা নিজেদের সমাজের পক্ষেই বেমানান। লেখাপড়া না শিখেও সমাজের অন্য অনেকে নানা কাজে দক্ষ, এদিকে লেখাপড়া শিখেও তারা কিছু পারে না। বনভূমির মাঝেই তাদের বাস, সেখানে পশুদের এড়িয়ে আত্মরক্ষা করতেও তারা পারে না। ফল? তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে, তারা নিজেদের সমাজের একজন হতে পারছে না।

অবশ্যই এগুলো কোনো নতুন কথা নয়। সারা বিশ্বেই এই ধাঁচ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'কালো' মানুষদের শিক্ষার এমনি সমস্যার কথা জানি আমরা। ১৯৭০ সালে মান্থলি রিভিউ পত্রিকায় Education: The Great Obsession[২] শিরোনামে একটা লেখা বেরিয়েছিল। লেখিকা সেখানে দেখিয়েছিলেন যে 'গরীব' কালোদের উপর 'বড়লোক' সাদারা নিজেদের সংস্কৃতি-সংপৃক্ত শিক্ষা চাপিয়ে দেবার জন্য শিক্ষায় অর্থব্যয় বাড়িয়েই চলেছে। প্রকৃত বিচারে সেই অর্থব্যয় নিজেদের সমাজে বেকার সমস্যা কাটানোর পথ হতে পারে, 'গরীব'দের সাংস্কৃতিক দাসত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হতে পারে, কিন্তু এতে গরীব 'কালো' মানুষদের শিক্ষা এগোবে না। তাই এ শিক্ষা নেওয়ারই দরকার নেই।

১৯৭০ সালের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতিকান্ত। এর মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষাকে জনমুখী করার জন্য চেষ্টা হয়নি এমন নয়। তবে এখনও আমাদের 'ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-পিরামিড' - এর শীর্ষে যাঁরা আছেন, শিক্ষার শুরু থেকেই পাঠক্রমটা তাঁদের ঘরের শিশুদের জন্যই এখনও সংরক্ষিত। পাঠক্রমে যা থাকলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতায় অনেক এগিয়ে শুরু করতে পারবে, তা দিয়েই পাঠক্রম শুরু। তারপর প্রতি পদে পদে একই ব্যবস্থা। এমনভাবে চলেছে যেন পাঠক্রমের মূল কাঠামোটা এমন ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

মূলত, প্রাথমিকের পাঠক্রম আমাদের চিন্তার অভিমুখটা ঠিক করে দেয়। সেই পাঠক্রম কার্যত পুরোটাই বইমুখী ও নিয়মমুখী, কর্মমুখী ও জীবনমুখী নয়। তাই তা শ্রমবিমুখ লোকদের জন্য সংরক্ষিত। 'উঁচু' জাতের এবং তাঁদের মধ্যেও 'আর্থিকভাবে স্বচ্ছল'রা অধিকাংশই কায়িক শ্রমবিমুখ। তথাকথিত 'মানসিক শ্রম' কে তাঁরা এমন মর্যদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন যে বাকিরা তাঁদের কায়েমী স্বার্থের বিষয়ে অন্ধ হয়ে থাকার এবং তাঁদের অনুকরণ করে কিছুটা সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছানোর বেশি কিছু ভাবতেই পারেন না।

এই প্রেক্ষাপটে চিরাচরিত ধারণা ভেঙে বিকল্প পাঠক্রম গড়ে তোলার প্রসঙ্গ। এন সি ই আর টির উদ্যোগে তেরো বছর আগে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এন সি এফ) - ২০০৫ তৈরি হয়েছিল। তাতেও বিকল্প পাঠক্রমের ভাবনা ছিল। আশা ছিল তা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাকে তার সঠিক বিকল্পের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে। কিন্তু রূপায়ণের সময় আসল কথাগুলো উহ্য রয়ে গেছে।

প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষা শুরু করা মানে বই পড়তে শুরু করা। মূলত দুভাবে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা শুরু করে। দশ-কুড়ি শতাংশ শিশুর শিক্ষা শুরু হয় ইংরাজী ভাষায়, গ্রাম শহরের নানা রকমের 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলে। তদের কথা এখানে বাদ রাখছি। বাকি যে আশি-নব্বই শতাংশ শিশু, তাদের শিক্ষা শুরু হয় মাতৃভাষায়। কিন্তু মাতৃভাষার নামে যে ভাষায় তাদের শিক্ষা শুরু করতে হয় তার নাম 'মান্যচলিত ভাষা'। প্রকৃত অর্থে তা একটা বিশেষ অঞ্চলের 'উঁচু' জাতের অভিজাতদের ভাষা।

এই শিশুদের শিক্ষা জীবনকেন্দ্রিক করে তোলারও একটা ঘোষিত লক্ষ্য আছে। কিন্তু বর্ণ পরিচয় থেকেই তাদের সামনে অচেনার ছড়াছড়ি। বেশ কিছুটা অচেনা পরিবেশের কথা। বেশ কিছুটা অচেনা ভাষা। ফলে তাদের বর্ণপরিচয়ই ঠিকমত হয় না। স্বভাবতই বই পড়তে শেখে না অনেক শিশু। তখন তারা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যারা ওই প্রথম ধাক্কাটা যা হোক করে কাটিয়ে ওঠে তারা পরেও এই মান্যচলিত ভাষাতেই পড়তে বাধ্য হয়। ওই ভাষায় কিছুতেই তারা নিজেকে প্রকাশ করা শিখতে পারে না। তাই হতাশায় দিন দিন শিক্ষাঙ্গন থেকে তারা মনে মনে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা এসব ভাবতে একেবারেই রাজি নয়।

আমরা সবাই জানি 'নীচু' জাতের লোকদের উৎপাদনী কাজ ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। হাতে কলমে করার জন্য সেইসব কাজ এবং পড়ার জন্য সেইসব কাজের কথা পাঠক্রমে থাকতে পারত। চাষি, কৃষিশ্রমিক, জেলে, গোয়ালা, নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতির ঘরের ছেলেমেয়েরা ঘরে ও পাড়ায় যেসব কাজ দেখে ও করে তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে নীচু ক্লাসের পাঠক্রম হতে পারে। সেই পাঠক্রমে পেয়ারা গাছে উঠে ডাঁসা-পাকা বেছে পেয়ারা পাড়া, নারকেল গাছে উঠে ডাব পাড়া, খেলার সময় পুকুরের জলে বল পড়ে গেলে সাঁতার দিয়ে তা তুলে আনা, ধান রোয়া ও কাটা খড় কেটে গরুকে খেতে দেওয়া ও গরুর দুধ দোয়া, কাঠের তক্তা থেকে করাত দিয়ে সরু করে ফালি কাটতে পারা এবংবিধ কাজের দক্ষতার জন্যও নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত। পাঠ্যের গল্প - কবিতায়, অংকে, ভূগোল-বিজ্ঞান-ইতিহাসে এমন বিষয় রাখা যায় যা এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুদের জীবনকথা। এমন ভাষায় তা লেখা যায় যা পড়লে 'নীচু' জাতের ও গরীব শিশুরা ভাবতে পারবে 'আমার কথা' পড়ছি। কিন্তু পাঠক্রমে এমন ব্যবস্থা করা হয়নি। শ্রমজীবি মানুষের কথা যদিও বা লেখা হয়েছে, তা 'ওদের' কাজ হিসেবেই লেখা হয়েছে। যেন পড়ুয়া শিশু শ্রমজীবির সন্তান হতে পারে না!

এই পটভূমিতে ভরসা কোথায় খুঁজব?

শিশু কীভাবে শেখে - এ বিষয়ে শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সাধারণ শিশুদের সমস্যার কথা খেয়াল রেখে গড়ে তুলবে হবে, বিকল্প শিক্ষার একটা তাত্ত্বিক রূপরেখা। ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এন সি এফ) - ২০০৫ এর সাহায্যও পাওয়া যাবে তা করায়। তারপর কীভাবে ছোট ছোট ধাপে সেই বিকল্প কার্যকর করা যাবে তারও একটা রূপরেখা দরকার।

প্রথমে একটা তাত্ত্বিক কাঠামো -

জীবনকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ঃ পরিবেশভেদে নানা জায়গায় নানা রকম পাঠ্যবই ব্যবহার - শিক্ষার পদ্ধতি প্রসঙ্গে এন সি এফ ২০০৫ জীবনকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছে। 'শিক্ষা শুরুর আগেই শিশু স্থানীয় বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেটাই তার শিক্ষা শুরুর প্রাথমিক ভিত্তি। শুধু ঠিকভাবে শুরু করাই নয়, আরও বড় কথা, এভাবে শুরু না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে বাস্তব জগতের সাথে নিজের সার্থক সংযোগ সাধন, এটাই সে বুঝতে শিখবে না।'[৩]

এভাবে শিশুর শিক্ষা শুরু করতে গেলে বইতে শিশুর চেনা জগৎ থাকা অপরিহার্য। চেনা ছবির পাশে কীসের ছবি তা লেখা থাকলে শিশুর পক্ষে লেখাপড়ায় ব্যবহৃত বর্ণচিহ্নের তাৎপর্য বোঝা সহজ হতে পারে। শেখা শুরুর পর প্রতি পদেই অনেকটা চেনার সাথে আসবে কিছুটা অচেনা বিষয়। একটু একটু করে নতুন জগতের সন্ধান পাবে। প্রতি ধাপেই অচেনা বিষয় এত কম থাকবে যে নতুন কিছু শিখছি এমন মনেই হবে না শিশুর। চারপাশের জগৎ দেখে সে বলতে শিখবে কী দেখছে। আত্মবিশ্বাসের সাথে সে স্বাধীন মত প্রকাশ করবে। ঘর, পাড়া, মাঠ, পুকুর থেকে সংগৃহীত জ্ঞান নিজের ভাষায় প্রকাশ করার সাহস পাবে। পারস্পরিক আলাপচারিতায় শিশুরা নিজেরাই শিখবে, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বই হয়ে উঠতে থাকবে গৌণ সহকারীর মতো, গড়ে উঠবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু এভাবে শিক্ষা শুরু করতে গেলে পরিবেশভেদের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের পাঠ্যবই কিছুটা আলাদা হবে। তবে মূল শিখন লক্ষ্য একই থাকায় এতে কোনও অসাম্য হবে না। সারস ও শিয়ালকে একই মাছের ঝোল খাওয়াতে গেলে যেমন আলাদা পাত্রে দেওয়া দরকার, এও ঠিক তেমনি।

ঘরোয়া ভাষায় শিক্ষারম্ভ ঃ স্থানীয় পরিবেশের কথা হলেই হবে না, শিশু সে

কথা তার ঘরোয়া ভাষাতেই পড়বে। এন সি এফ-২০০৫ এর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ...'শিশুর ঘরোয়া ভাষাই তার বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত — উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে যদি শিশুর ঘরোয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম নাও করা যায়, তাহলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অবশ্যই শিশুর ঘরোয়া ভাষার মাধ্যমেই শিখন সম্পন্ন করতে হবে।'[৪]

উৎপাদনী কাজকে শিখন সামগ্রীতে পরিণত করা ঃ উৎপাদনী কাজকে জ্ঞান আহরণে ব্যবহারযোগ্য শিখন-উপকরণ হিসেবে দেখার কথাও এন সি এফ - ২০০৫ এ বলা হয়েছে। গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা মাছ ধরা, ছাগল, গরু, হাঁস-মুরগীকে খেতে দেওয়া, ঝড়ের পরে আম কুড়োতে ছোটা, গাছে উঠে পেয়ারা পাড়া, পরাগ সংযোগের জন্য ফুল ছোঁয়ানো — বেশ কিছুটা পরিমাণে এসব কাজ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব করতে তারা ভালোও বাসে। এইসব কাজের সাথে পাঠ্যকে নানাভাবে যুক্ত করতে হবে। এমন করলে তবেই ওই শিশুরা ওসব কাজের মাধ্যমে জ্ঞান গঠন করতে পারবে।

শিশুর মানসিক বিকাশের সাথে সুসমন্বয়ভাবে ও পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণে শিক্ষাঃ এন সি এফ - ২০০৫ এ বলা হয়েছেঃ 'যে বিষয় শিখতে শিশুর মানসিকভাবে প্রস্তুতি হয়নি, জোর করে তা খেতে গেলে সেই বিষয়টা পরবর্তীকালেও শিশু শিখতে চায় না।'[৫] মাতৃভাষা শেখার আগে ইংরাজী শুরু করে যে কোনও লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হবে, তা বোঝাতে একথার বিকল্প নেই। কিন্তু পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় শিশুকে এগিয়ে দেওয়ার ব্যগ্রতায় ইংরাজী শেখার তাড়াহুড়ো অধিকাংশেরই। এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গী যে কতটা ক্ষতি করে তা বোঝাতে এন সি এফ-২০০৫ এ বলা হয়েছে 'বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে যে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা দেখা যায় তা শিক্ষাকে ক্রমেই এক পার্থিব সাফল্য উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করে ফেলছে।... এটা শিশুদের উপর অকারণে অনেক চাপের সৃষ্টি করছে এবং তাদের মূল্যবোধকেও বিকৃত করছে। একই কারণে একে অন্যের থেকে শেখার পদ্ধতিও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।'[৬] 'অথচ শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী - শিক্ষকের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া জ্ঞান গঠন কঠিন হয়। নতুন আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শেখার আগ্রহ বজায় রাখা ও বাড়ানোর ব্যবস্থ করাঃ আমরা প্রায়ই ভাবি শুদ্ধভাবে পড়তে -লিখতে শেখাটা বুঝি খুব দরকারি। তাই শতবার ড্রিল করা দরকার। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। শিশুর উচ্চারণের শুদ্ধতা বা নিয়ম নিয়ে বেশি বোঝাতে গেলে শিশু কথা বলার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। একইভাবে লেখার সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা নিয়ে তাকে বেশি বললে সে বুঝতে শিখবে না যে লেখার সময় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করাই আসল কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গী একটু নতুন লাগতে পারে, কিন্তু এটাই সঠিক ও শিশুকেন্দ্রিক চিন্তা। নিখুঁত উত্তর লেখার লক্ষ্যে একই বিষয় বারবার পড়ালে আর লেখালে শিশুর সৃজনশীলতা নষ্ট হয়। তাই একই জিনিস বা বইয়ের পড়া বারবার না পড়িয়ে তাকে নতুন ধরনের, কখনো কখনো 'চ্যালেজিং' এবং স্বাধীন চিন্তাবিকাশের সহায়ক কাজ দেওয়া হলে ভাল। সে এরকম কাজ করতে উৎসাহ পাবে এবং উন্নত স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারীও হবে।

শিখতে শেখা ও জ্ঞান গঠন করতে করতে শেখা ঃ কেমন করে শিখতে হয় তা শেখাই সবচেয়ে বড় কথা। জ্ঞান গঠনের মাধ্যমে শিশু শিখবে। সেটা কেমন? এন সি এফ- ২০০৫ এ বলা হয়েছে '(শিশুর) বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানকে উৎসাহ দিতে হবে, কারণ তা এক মূল্যবান শিখন উপকরণ। .... প্রায়শই অনেক বিষয় সম্পর্কে শিশুদের একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। কিন্তু যেভাবে বললে শিক্ষকরা তাঁদের ধারণাকে গ্রহণ করবেন, তেমনভাবে তারা বলতে পারে না।....এখানেই রয়েছে কোন বিষয় সম্পর্কে 'জানা' এবং 'প্রায় জানা'-র মধ্যের একটা ফাঁক। এখান থেকেই শিশুর নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হতে পারে।'[৭] শিশুকে ঠিকভাবে উৎসাহ দিতে পারলেই তারা ওই ফাঁক ভরাট করে জ্ঞানগঠন করতে শিখবে।

কিন্তু এইরকম বিকল্প শিক্ষায় পৌঁছানো যাবে কীভাবে? এক ধাপে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। শিক্ষা সংস্কারের যে দূরদৃষ্টি এন সি এফ- ২০০৫ এ ফুটে উঠেছে তা মনে রেখে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। গরীব ঘরের দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র - ছাত্রী বাড়িতে যেসব কাজ করে সেইসব কাজে দক্ষতার জন্য নম্বর রাখার ব্যবস্থা করার দিন এখনও আসেনি। এখনই তা করতে গেলে সেটা বেশিরভাগ লোকই মানতে পারবেন না। শ্রমভয়ে ভীতরা তো 'গেল গেল' রব তুলবেনই। যাদের সুবিধা হবে এ ব্যবস্থায় তাঁরাও ভাববেন ' এ আবার কী শিক্ষা'।

আগে দরকার জীবনকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক বই। প্রথমে গরীব শিশুর উৎপাদনী কাজে অংশগ্রহণের গল্প আসবে পাঠ্যবইতে। সে গল্প এমনভাবে লিখতে হবে যাতে গল্পের সেই শিশুর কাজে আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে, হীনমন্যতার কোনও চিহ্ন না থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের শিক্ষা প্রসঙ্গেও হয়তো আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাবে। হয়তো কায়িক শ্রমজীবীর সন্তান দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ই বহু রকম গাছের পাতায় হাত বুলিয়ে জেনে যায় কোন পাতাটা কেমন? ফলে চোখে না দেখে হাত দিয়ে ছুঁয়েই তারা বলতে পারে, কোনটা আম পাতা আর কোনটা কাঁঠালপাতা, কোনটা ধানের গাছ আর কোনটা আখের গাছ। নানা ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করতে শেখার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণির গ্রামের ছাত্র ছাত্রীকে দেখে ছুঁয়ে, শুঁকে নানারকম গাছ পাতা সনাক্ত করতে দেওয়া যেতে পারে। শহরের শিশুদের তাদের পরিবেশে সহজলভ্য জিনিস দেওয়া যেতে পারে নানা ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সনাক্তকরণ শেখার জন্য। নিজের শরীর সম্পর্কে মাপামাপি করে মাপজোপ শেখা ও নিজের শরীরকে চিনতে শেখায় হয়ত সব অঞ্চলের শিশুকেই উৎসাহী করে তোলা যাবে।

তবে 'নিজে করে শেখা' যতটা হলে ভালো হয়, গোড়াতে ততটা করার চেষ্টা করা যাবে না। কিছু কিছু বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা পরোক্ষ সহায়তা নিয়ে শিশুরা নিজেরাই হাতেনাতে নানারকম কাজ করছে - এমন ঘটনার কথা বইতে লিখতে হবে। তারপর বইয়ের অনুশীলনীতেও ওইসব কাজ করতে বলতে হবে শিশুদের। সেসব কাজ করে যা দেখতে পেল তা বইতেই লিখতে বলতে হবে। বইতে এমন কথা থাকলে শিক্ষক শিক্ষিকারাও তাদের এভাবে শেখার উৎসাহ দিতে পারবেন। অনেক জায়গায় বইয়ের পাঠ্য অংশই ফাঁকা থাকবে, শিশুদের বলা হবে নিজে নিজে দেখে নাও, তারপর নিজের বই লিখে নাও। এভাবে কিছু বই আমরা লিখেওছি।'[৮]

এবার ঘরোয়া ভাষার কথা। এটা সত্যি যে অচেনা ভাষা শিশুকে শিক্ষার আঙিনা থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। গোড়াতেই জোর করে মান্যচলিত ভাষা শেখাতে গেলে তার সাথে শিশুর মানসিক বিচ্ছেদ তৈরি হয়, পরবর্তীকালেও শিশু তা ঠিকমতো শিখতে পারে না। কিন্তু মান্যচলিত ভাষা যাঁদের ঘরোয়া ভাষা নয়, তাঁরাও এটা ভাবতে অভ্যস্ত যে প্রথম থেকেই মান্যচলিত ভাষা শেখা দরকার। তাঁরা ভাবেন, ঘরে তো ঘরোয়া ভাষা শিখেইছে। আর কেন? পড়ার বইতে মান্যচলিত ভাষা থাকুক — তারা সেটুকু শিখুক। এমন ভাবার কারণ তাঁরা 'Learn, unlearn and relearn' কথাটা বোঝেন না। ভাবেন, শেষ পর্যন্ত যা শিখতে হবে প্রথম থেকে সেটা বারবার পড়ে মুখস্থ করলেই ভাল।

এই প্রেক্ষাপটে ঘরোয়া ভাষার ব্যবহার শুরু করতে হবে। তাই প্রথম প্রথম স্থানীয় শব্দ ব্যবহার বর্ণ পরিচয়েই সীমাবদ্ধ রাখতে হতে পারে। বর্ণ চেনা সম্পূর্ণ হওয়ার পরপরই হয়ত মান্যচলিত ভাষা আনতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে শব্দ, বাক্য ব্যবহার করায় মোটামুটি ভাল দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করা দরকার। তাতে শিশুর বানান বিষয়ে ধারণা, বাক্য গঠনের ধারণা, কল্পনাশক্তির বিকাশ এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। তাই নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পুরোটাই ঘরোয়া ভাষার ব্যবহার দরকার। একথাই এন সি এফ- ২০০৫ এ বলা হয়েছে। এটা মনে রেখে ধাপে ধাপে এগোতে হবে।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১) http//thewire.in/education/adivasis-youth-odisha-life-skills-education Are Young Adivasis in Odisha Losing Life-Skills Through Schooling?
২) Grace Lee Boggs, Education: The great obssession, Monthly Review, September, 1970
৩) NCF-2005 :Ch 2 Learning and knowledge, $2.7 Children's knowledge and local knowledge. p 30
৪) NCF-2005 :Ch 3 Curricular Areas, School stages and assessment 83.1.1 Language Education.p.37
৫) bid :Ch 2 Learning and knowledge 82.3, Development of learning p.15
৬) bid :Ch 1 Perspectives, 81.1 Introduction p.2
৭) bid :Ch 2 Learning and knowledge 82.3, Development of learning p.17
৮) 'আমি ও আমার পরিবেশ' ও শেখার সাথীর অন্যান্য বই

* লেখক রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, হুগলির প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং শেখার সাথীর সভাপতি

প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

ভাষা ও সংযোগের বিষয়টি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার দাবি রাখে। ভাষার সঙ্গে চিন্তার এবং চিন্তার সঙ্গে শিক্ষা ও মননের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা অধিকার আইনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বলা হয়েছে যতটা সম্ভব। অথচ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন তথা কমিটির এ বিষয়ে নানা অভিমত রয়েছে যা আলোচনা প্রয়োজন।

উডের ডিসপ্যাচে (১৮৫৪) প্রাথমিক ও দেশজ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে গণ্য করার সুপারিশ করা হয়েছে। ১৮৮২ সালের ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হান্টার কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় তালিকায় দেশীয় ভাষার ওপর জোর দিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৮৪৮-৪৯) প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষার পক্ষে সুপারিশ করেছেন। 'During graded one to five the pupils will learn only the mother tongue; in grades six to eight emphasis should be on the mother tongue and the federal language'.

মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫৩) মাতৃভাষাকে অন্য ভাষা শেখার উপায় হিসেবে দেখেছেন ''At the senior Basic or the Middle School stage, therefore, when the child has already learnt the mother-tongue and it will continue to pursue its study, Hindi and English may be introduced''.

১৯৫৭ সালে ভারত সরকার Official Language Commission গঠন করে। কমিশন সেই রিপোর্টে লিখেছে, ''So far the child undergoing free and compulsory elementary education terms of Article 45 of the Constitution is concerned, it would be waste to make him undergo any instruction in the English Language, Instruction in a language as totally foreign as English, for such a short period, would serve no lasting purpose at all and would merely result in a coutailment of educational time available for other subjects and for the regional language''.

কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) - এর বক্তব্য, ''In order that a sound foundation in the mother tongue may be laid at this stage, no language other than this should be introduced during the first four years.

কমিশনের আরও বক্তব্য, ''Today the basic issue we have to face in primary education is to to teach the mother tongue well to eradicate illiteracy, and the learning of additional language is a costly and difficult load which the education system is ill-equipped to bear''.

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘‘মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপর যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ব করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।’’

একাধিক ভাষা শেখায় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন ব্যক্তির জীবনে ও তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। প্রতিবছর অনেকগুলো ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। ভাষা মানবসমাজের সমবেত সৃষ্টি হলেও বৈষম্যের সমাজে তা ক্ষমতাশালী শ্রেণি বা গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের অস্ত্র হয়ে ওঠে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গেও ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। একই দেশের মধ্যেও শ্রেণিতে শ্রেণিতে ভাষার পার্থক্য দেখা যায় এবং প্রতিফলিত হয় শ্রেণির আধিপত্য।

আমাদের রাজ্যে বিদ্যালয় ছুট হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে ভাষাও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। বহু ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা ঘটে যেখানে শিক্ষক শিক্ষিকা বাংলা ভাষায় কথা বললেও বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীরা সে ভাষা বুঝতে পারে না। আর অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে ধারণা হয়, ‘‘এরা বোঝে কম, পড়াশোনায় গুরুত্ব দেয় না, স্কুলে না এসে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, এদের দিয়ে খুব কিছু হওয়ার নেই।’’ শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই ধরনের মানসিকতা শিশুদের আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

টোটো শিশুদের মাতৃভাষা টোটো ভাষা। এলাকায় নেপালী জনবসতি থাকার কারণে নেপালী ভাষাও স্বাভাবিকভাবে রপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে যে বাংলাভাষা ব্যবহার হয়, তা তাদের কাছে অজানা। এর ফলে শেখার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা ও দূরত্ব তৈরি হয়, সেখানে এই টোটো শিশুদের যে কোনও দোষ নেই তা বোঝা প্রয়োজন। মাতৃভাষায় শিক্ষা পাওয়া যে তাদের মানবিক অধিকার সে কথা ভুলে গেলে চলবে কী করে?

‘টোটোজাতির কথা’ গ্রন্থে বিপ্লব নায়ক লিখেছেন, ‘টোটো বাবা-মায়েরা যখন বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে আসত, পরিণীতা সাংমা-দের তখন বাচ্চার নাম, বাবা-মার নাম ইত্যাদি সরকারি নথিপত্রে নিবন্ধীকরণ করে সরকারি শিক্ষা দফতরে পাঠাতে হতো। কিন্তু টোটো ভাষার নাম ইংরেজি হরফে বা বাংলা হরফে ঠিকমতো লেখা যেত না, নানারকম হেরফের হয়ে যেত। ফলে উচ্চতর দফতর থেকে সে সমস্ত নথিপত্র আবার ফিরে আসত সংশোধনের জন্য, বানান ভুলের জন্য ভর্ৎসনা সমেত। এই ‘হয়রানি’ থেকে মুক্তি পেতে পরিণীতা সাংমা-রা একটা কৌশল নিলেন। তাঁরা ভর্তি হতে আসা বাচ্চাটির টোটো ভাষার নাম নিবন্ধীকরণ না করে নিজেরা একটা বাংলা ভাষার নাম উদ্ভাবন করে সেই নাম নিবন্ধীকরণ করতে শুরু করলেন। এভাবে কারো কারো ক্ষেত্রে সেই বাংলা নাম সমাজেও ব্যবহৃত হতে লাগল। বাংলা নাম থাকার সঙ্গে স্কুলে পড়ার কৃতিত্বের সমাপতন ঘটে বাংলা নাম-কে কিছুটা সম্মানচিহ্নের মাত্রা দিয়েছিল, ক্রমশ ফলে টোটো মা-বাবারাও বাংলা ভালো না জানলেও ছেলে-মেয়েদের বাংলা নাম দিতে শুরু করলেন।’’

আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলেও শিশুর মাতৃভাষায় দেওয়া নাম পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। ক্ষমতার ভাষা বা ভাষার আধিপত্যবাদ একেই বলে।

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ আয়োজিত শিশু অধিকার দিবস পালন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক–এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা–৭০০০৩১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
দূরভাষ: ০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল: wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট : wben.info মুদ্রণে: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ: ২২৪১ ৯৬৩৩ *অনুদান : ৬ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য